Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.22-28
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পার্থ গুহবক্সী ও কানাই কুণ্ডুর ছোটগল্প: অধিকার ভাবনার নানা অভিমুখ

নবীনচন্দ্র দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The subtle distinction between acceptance and relinquishment determines the true meaning of rights. It also establishes the actual position of demand and value, corresponding to the acceptance or exclusion of rights. The word right is associated with the idea of ownership whether willingly or unwillingly. There is no hesitation in saying that this property itself is an indirect command to be subjugated. The subjugation that takes place in the guise of ever tying people down in love. Sometimes it happens in the strategy of coercion to maintain permanent interests. Although these two positions of rights are not direct. The human consciousness lies within the subconscious game of hide-and-seek. So love sometimes has to surrender to this right. Again the individual sovereign finds his position in the possession of rights. And through this, a strange game of coercion of human rights is created. In fact the word right is as simple as it is with respect to things, it is as complex as it is with respect to persons. Because the rights of subject matter are more or less variable. But his position in the individual is mostly reactionary. And because it is reactionary, the topic of occupation is associated with it. Kanai Kundu and Partha Guhbaksi's characters in the story have this idea. Sometimes directly, sometimes indirectly. In fact, this is an extreme truth hidden behind modernity. Based on which the calculation of human occupation is developed.

Keywords: The thought of rights, Seizure, The deception of love, State exploitation, Political rights, The rights of Deception.

মূল আলোচনা : 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব'– অধিকারের ভাবনা অনেকটা এইরকমই। গ্রহণ এবং বর্জন — এই দুইয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্যই নির্ধারণ করে অধিকারের আসল মানে। সঙ্গে চাহিদা ও মূল্যের বাস্তবিক অবস্থান জানিয়ে যায় অধিকারের গ্রহণ কিংবা বর্জনের সঠিক রূপ। 'স্ত্রীরপত্র' গল্পে বিন্দুর ওপর মৃণালের যে অধিকার তা ছিল গ্রহণের অধিকার। ভালোবাসার অধিকারেই ছিল তা পুষ্ট। ব্যবহারিক জ্ঞানে যেখানে চাহিদা ও মূল্য দুই'ই গৌণ। কিন্তু যে অনাবশ্যক ভাবনা নিয়ে বিন্দুকে তার শ্বশুরবাড়ি গ্রহণ করে, তাকে বলা চলে অধিকারের জবরদখল। যেখানে চাহিদা আর মূল্যই প্রধান। ভালোবাসা নয়। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অধিকার' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন "অধিকৃত বিষয়"[১] হিসাবে। তাই 'অধিকার' শব্দটির সাথে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্তেও স্বত্বভাবনা জড়িয়ে পরে। যে স্বত্বভাবনাই কেড়ে নিয়েছিল বিন্দুর প্রাণ। বলতে দ্বিধা নেই এই স্বত্বই জন্মদেয় অধীনস্থ হয়ে থাকবার পরোক্ষ নির্দেশ। যে অধীনস্থ হওয়া ঘটে মানুষকে কখনো "নবীনা

বীনায় বেঁধে"[২] রাখার ছলনায়। আবার কখনো ঘটে কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখার জবরদখলি কৌশলে। যদিও অধিকারের এই দুই অবস্থান প্রত্যক্ষ নয়। মানবিক চেতন অবচেতনের লুকোচুরি খেলার মাঝেই এর অবস্থান। তাই ভালোবাসাকেও কখনো হার মানতে হয় এই অধিকারের কাছে। আবার ব্যক্তি সার্বভৌম খুঁজে পায় নিজের অবস্থান অধিকারের দখলদারিত্বে। আর এর মধ্য দিয়েই তৈরি হয় মানুষের অধিকারবোধের এক অদ্ভুত জবরদখলি প্রতিযোগিতা।

১৯৫৩ সালে পশ্চিমবাংলার ইড়পালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কানাই কুণ্ডু। লোধা, সাঁওতাল, মাহাতোদের সংস্পর্শে কেটেছিল তাঁর শৈশব। খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের জীবন ও স্বভাব। সত্তরের মধ্যভাগ থেকে তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। সাহিত্যচর্চা করতে এসে সেই ফেলে আসা দিনগুলো ভাবিয়েছিল তাঁকে। যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর নানা গল্পে। যার খ্যাতি কেবলমাত্র এই বাংলায় নয়, ওপার বাংলার মানুষেরও মন জয় করেছে সহজে। অন্য দিকে পার্থ গুহবক্সীর (১৯৫৬-) সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত অনুবাদের মাধ্যমে। ফরাসি ভাষার প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাঁকে ফরাসি ভাষা শেখায় আগ্রহী করেছিল। এবং একসময় তার প্রতিফলন ঘটেছে ফরাসি নাটক ও গল্পের অনুবাদের মাধ্যমে। সেই প্রতিফলনের মধ্যে যেমন আছে রমাঁ রলাঁর নাটক '১৪ ই জুলাই', তেমনি আছে বেকেট, কামু, কাফকার মতো বহু বিখ্যাত লেখকের নানা গল্প। পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী হলেও সাহিত্য অনুরাগ এবং শিল্পীগুণ তাঁকে ভাবিয়েছে নানা ভাবে। আর সেই ভাবনারই শরিক হয়ে একসময় যোগদান করেন 'নতুন নিয়ম' নামক ছোটগল্প আন্দোলনে। ভেঙে ফেলতে চান নিয়মানুক কাহিনির ইমারতকে। বললেন, লেখার প্রতিটি শব্দকে হতে হবে চমকপ্রদ এবং আকর্ষণীয়। যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চাইলেন গল্পের একমুখী কাঠামোকে। যার ছাপ রয়ে গেছে তাঁর 'নষ্টভ্রষ্ট গল্প', 'কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার ও অন্যান্য', 'দৈনিক রাশিফল'-এর মতো গল্পগ্রন্থে প্রকাশিত গল্পের মধ্যে। দেখা যায় পার্থ গুহবক্সী ও কানাই কুণ্ডুর গল্পে বিষয় ও ভাবনার বহু বৈচিত্র্য এসেছে। যেখানে কানাই কুণ্ডুর গল্পের চরিত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই লোধা বা সাঁওতাল সম্প্রদায়ের। ফলে তাদের জীবনের নানা সংস্কার বা কুসংস্কার নির্মাণ করেছে কানাই কুণ্ডুর গল্পের বিষয়। যার দৃষ্টান্ত আছে 'অসীমালয়', 'অমৃত মন্থন', 'প্রসঙ্গ মলতুবি', 'সুজাপুরের লকড়িবাবু'র মতো গল্পে। আবার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কাটিয়েছেন বাংলার নানা অঞ্চলে। পুষ্ট হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি। তাই সেই সব অভিজ্ঞতার ছাপ সহজেই এসেছে তাঁর গল্পের চরিত্র ও বিষয়ে। যার প্রতিনিধিত্ব করে, 'সোনার মাছি', 'এবং আমিও', 'লোকটা', 'কোদালি', 'অক্ষরবৃত্ত', 'গল্পপাঠ', 'ভারতবর্ষের একজন' -এর মতো গল্প। সেখানে দাঁড়িয়ে পার্থ গুহবক্সীর গল্পে শোনা গেছে সত্তরের রাজনীতির প্রতিধ্বনি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'ভাঙামূর্তির রহস্য', 'শহীদ স্মরণে'র মতো গল্পের কথা। এর পাশাপাশি আধুনিক জীবন সমস্যা। এবং সামাজিক সমস্যার সুর তাঁর গল্পে প্রধান ভূমিকা নেয়। আবার তার সঙ্গে আছে বিশ্বায়নের মতো আধুনিকতম 'বুকের শব্দ', 'আলো রহস্য', 'অমৃতলোকের যাত্রী' যার উদাহরণ হতে পারে। লক্ষ্য করার মতো পার্থ গুহবক্সী ও কানাই কুণ্ডুর গল্পের বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও, গল্পের মূলগত সুর অনেক ক্ষেত্রে একটি ভাবনাকে কেন্দ্র করেই নিজস্ব চলন ধরেছে। আর তা হল অধিকারবোধের ভাবনা। যা কখনো এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। আবার কখনো পরোক্ষভাবে। তাঁদের গল্পের বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কানাই কুণ্ডু যখন গল্পে জুমেলির ('অমৃত মন্থন') কথা বলেন, তখন বিতানের প্রতি জুমেলির ভালোবাসার ক্লান্তিহীন আবেদনের অধিকারকেই তুলে ধরেন। কিন্তু বিতানের

ক্ষেত্রে তা ভিন্ন। কেননা "বিতান কেবল পয়সা বোঝে। কখন তার হাতের মুঠায় পয়সা জমা হবে। তার কষ্টটা বুঝতে চায় না।"[৩] আর এই কষ্ট হলো পেটে বাচ্চা ধরেও কোলে বাচ্চা নিয়ে আদর করতে না পারার কষ্ট। পাঁচবার 'পুহাহি' হয়েছিল জুমেলি। কিন্তু প্রতিবারই সাত মাসের মাথায় তার "সারা স্বপ্না রক্তের নালি হয়ে ধুয়ে যায়।"[৪] কিন্তু বুকে বইতে থাকা দুধের জোয়ার আটকাবে কে? তাই বিতানের কথায় বুকের দুধ বিক্রি করে জুমেলি হাটে হাটে। "বাচ্চাটির মা বিতানের হাতে আধুলি জমা দিতেই সে হাত বাড়ায়। বেঁকে যাওয়া বাচ্চাটাকে পরম মমতায় কোলে টানে। কালো জামের মতো স্তন-বৃন্ত মুখে দিতেই সে আশ্চর্য শান্ত। দীর্ঘ আ... হ...হ শব্দে জুমেলিও স্বস্তিতে উদার।"[৫] এইভাবে ভাত কাপড়ের জোগাড় হয় তাদের। মেটে শখের কেনাকাটাও। নিজের কষ্টকেও সে বিতনের ভালবাসার অধিকার বলে ভাবতে শিখেছিল। কিন্তু একসময় তার ভুল ভাঙে। ভাঙে বৈদ্যের কথাতে-

> "আমার চার বাচ্চা তোর দাওয়া খেয়ে বরবাদ হল। একো পয়দা হল না। তু চুপ রহনে...
> তোর মরদ তো খালাসিকে দাওয়া খরিদ করেছিল রে। পয়দাকে নাহি। জরা উসিকো পুছ।"[৬]

জুমেলির বুঝতে বাকি থাকে না আর কিছু। সে বোঝে তার ভালোবাসা হারিয়ে গেছে বিতানের ব্যক্তি স্বার্থের অপরিসীম অভিলাষার কাছে। তবুও তাকে ঘরে ফিরতে হয়। যেমন "নিঃসঙ্গ কোনও দুধেল গাই চেনা পথে মালিকের আস্তানায় ফিরে আসে।"[৭] আর এই ফিরে আসাই যেন কোথাও অধিকারের স্বত্বভোগী মানুষটির জবরদখলী বস্তুতে পরিণত করে তাকে। যেখানে ভালোবাসা তুচ্ছ। সত্য তো কেবল অধিকারের জবরদখল। তাই তো বলতে হয়,

> "পুরুষেরা তাদের জীবনের বিশেষ কোনো সময়ে সংরক্ত প্রেমিক হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে বলা যেতে পারে 'মহাপ্রেমিক'; তীব্রতম আবেগে আত্মহারা অবস্থায়ও তারা কখনো সম্পূর্ণরূপে অধিকার ত্যাগ করে না; এমনকি দয়িতার সামনে নতজানু অবস্থায়ও তারা যা চায়, তা হচ্ছে দয়িতাকে দখল করতে; তাদের জীবনের মর্মমূলে তারা রয়ে যায় সার্বভৌম কর্তা;"[৮]

মনে রাখতে হবে নারীর চাহিদা তার মনের আগুন নেভাতে অক্ষম। তাই ভালোবাসায় পুরুষ ও নারী মনের ব্যতিক্রমী অবস্থান মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায় গল্পে। কান পাতলে শোনা যাবে পার্থ গুহবক্সীর 'বুকের শব্দ' গল্পে সেই অধিকারেরই ব্যতিক্রমী প্রতিধ্বনি। যেখানে তিতিরকে পাবার জন্য গল্প কথককে নানা কসরত করতে দেখা যায়। কিন্তু তার পরিবর্তে তাকে তিতিরের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে, "আমাকে ভালোবাসার জন্য তুমি পরীক্ষা দিতে রাজি?"[৯] আসলে গল্প কথকের বুকে ধ্বনিত হওয়া ভালোবাসার নবীন-বীনার সুর বুঝতে চায় না তিতির। তার বদলে চায় খ্যাতি ও ঐশ্বর্য উপভোগ করতে। তাই তিতিরকে বলতে শোনা যায়, "আমার জন্য তোমাকে শরীরসাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হবে।"[১০] আবার কখনো, "আগে সাগরজিকে অনুসরণ করে ভারতের দর্শন, বেদবেদান্ত আয়ত্তে এনে নিজেকে প্রকৃত জ্ঞানী করে তোলো; তারপর আমার কাছে ক্ষুদ্র প্রেম পাপ পুণ্য নিয়ে আসবে।"[১১] কিংবা, "আগে তুমি বীরুভাইয়ের মতো সত্যিকারের মার্সিডিজের মালিক হও, তারপর আমার কাছে ক্ষুদ্র প্রেম পাপপুণ্য নিয়ে আসবে।"[১২] -এ যেন ভালোবাসার অগ্নিপরীক্ষা। আসলে এই সকল পরীক্ষার মাধ্যমে তিতির চায় তার প্রেমিকের ওপর নিজের অধিকার বজায় রাখতে। তাই তার কাছে ভালোবাসা নয়, অধিকারের দখলদারি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই শেষে গল্পকথক নিজের ভালোবাসার তীব্রতা বোঝাতে তিতিরকে চেপে ধরেছে। কিন্তু তাতে প্রতিক্রিয়া হয়েছে

ভিন্ন। কথক বলছেন, "ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গ্লোশাইন নেলপালিশ করা নখ দিয়ে আমার জামা তিতির ছিঁড়ে ফেলল। গেঞ্জি। বুকের চামড়া জ্বালা করতে লাগল। ডিংডং শব্দ আরো বেড়ে উঠল।"[১৩] আধুনিক অতি সভ্য মানুষের এ যেন এক ভয়ঙ্কর রূপ। যেখানে ক্ষমতা বজায় রাখাকেই মান্যতা দেওয়া হয় অধিকার রূপে। ভালবাসার আত্মনিবেদন যেখানে নিতান্তই মূল্যহীন। প্রকৃতপক্ষে এটিই হলো ভালোবাসার অধিকারবোধের ছলনা। যাকে পার্থ গুহবক্সী ও কানাই কুণ্ডু তাঁদের গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

এ কথা ঠিক যে শিল্পের সত্য আর বাস্তবে সত্য এক নয়। কিন্তু মানতে অসুবিধা নেই শিল্প বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। পার্থ গুহবক্সীর 'পোড়া প্রদর্শনী' গল্পে সেই সত্যকেই উঁকি দিতে দেখা যায়। রাজদূত তথা রাজকুমারীর আগমনের জন্য গল্পের মঞ্চ বানিয়েছেন লেখক। যে মঞ্চ আসলে রাষ্ট্রনায়কদের রাষ্ট্রের বাস্তব সত্যকে চাপা দেবার জবরদখলি কৌশল মাত্র। "প্রকৃতির তুলিতে, উৎসবের আনন্দে দশদিনের মধ্যে পোড়ামাটির রং মুছে ফেলা হয়। ভূস্বর্গের এই ঐতিহাসিক মর্গ জানে কোন উপলক্ষ্যে নিজেকে কিভাবে বদলাতে হয়।"[১৪] সঙ্গে বদলে নিতে জানে নগরবাসীরাও। জানে নিজেদের অধিকারের চালচলনের সীমারেখা। কিন্তু রাষ্ট্র নেতারা তা বোঝে না। তাই তারা নাগরিকদের নিজেদের মতো করে সচেতন করতে চান। চান নিজেদের অধিকারের আওতায় চেপে রাখতে। আর এই চেপে রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্ভীক নিরপেক্ষ সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন, সরকারি এবং বেসরকারি তথ্যসংযোগ কেন্দ্রগুলিকে। আসলে এটি হল বাস্তবের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রকৃত সত্য। যেখানে রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা হয় না জনকল্যাণে, তার বদলে বানিয়ে তোলা মিথ্যেকেই জোরপূর্বক শেখানো হয়। আর শেখানোর মাধ্যম হিসাবে বেছে নেওয়া হয় নির্ভীক নিরপেক্ষ গণমাধ্যমগুলিকে। যা জবরদখলি রাষ্ট্রক্ষমতাকে রাষ্ট্রশোষণের কাজে ব্যবহারের নামান্তর মাত্র। পার্থ গুহবক্সীও যেন এই ভাবনার দিকে টিকেই স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে। তাই তিনি লিখছেন-

> "নাগরিকদের একাংশ ঘরকন্নার খেলা থামিয়ে দূর থেকে ভেসে আসা শব্দ শোনে। একাংশ হিসাবের খাতায় কলম ডুবিয়ে রাষ্ট্রনায়কের মুণ্ডপাত করে। একাংশ ছবিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছটফট করে। একাংশ ভিড় দেখতে দেখতে চায়ের কাপে আরশোলার গন্ধ পায়। একাংশ ছুটির দিনে একসঙ্গে বসে রাজকুমারীর স্বাস্থ্যপান করে। একাংশ পাশের ঘরে দিবানিদ্রা দেয়।"[১৫]

কিন্তু এই জবরদখলি মনোভাব বাস্তবের প্রকৃত সত্যকে বেশিক্ষণ চেপে রাখতে পারে না। এবং এক সময় উঠে আসে জবরদখলের প্রকৃত স্বরূপ "...এলোমেলো রাস্তায় পোড়ামাটি বেরিয়ে পড়ে।"[১৬] বেরিয়ে পড়ে পোড়ামাটির আসল স্বরূপ। যার আবরণ আধিকারের পেশি প্রদর্শনের নামান্তর মাত্র। যা সৃষ্টিতে অক্ষম। কেবলমাত্র ভোগেই সক্ষম। আর এই ভোগের কৌশলই অধিকার ভোগের কৌশল। 'পোড়া প্রদর্শনী' নামক গল্পে রূপকের ছন্দে লেখক সেই অধিকার ভোগের কৌশলকেই অব্যাক্ত করে দেখাতে চেয়েছেন পাঠকের সামনে।

রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের এই জবরদখলি খেলা আবার এসেছে কানাই কুণ্ডুর 'প্রসঙ্গ মলতুবি'র মতো গল্পেও। যেখানে লেখক শিক্ষিত বেকার আরাতুলের স্মাগলার থেকে দেশের নেতা হয়ে ওঠার কালানুক্রমিক বর্ণনা শুনিয়েছেন। আদিবাসী শিক্ষিত বেকার ছেলে আরাতুল। একেবারে বেকার বলা ভুল। কেননা কুলি, বাসের টাইমারের মতো কাজের সুযোগ সে পেয়েছে। কিন্তু সে করেনি। তার বদলে ধীরার

কথায় 'বেবসা' শুরু করে সে। জঙ্গল সীমানা থেকে গুলি, বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল পাচারের ব্যবসা শুরু করে সে। ব্যবসায় নেমে সে বোঝে টাকার ক্ষমতা। এবং সেই ক্ষমতা দিয়ে অধিকার বজায় রাখবার খেলা। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে ক্ষমতার আসল মজা টাকায় নয়, প্রশাসনিক অধিকার কায়েমের মধ্যে। তাই নেতা হবার স্বপ্ন দেখতে থাকে আরাতুল। ইতিমধ্যে তাকে জেলে পুরে দেওয়া হয়। বিনা বিচারে চলতে থাকে আরাতুলের জেল পর্ব। সে বুঝতে পারে বিরোধী পার্টিই এই কাজ করেছে। তাই নিজের লোক দিয়ে নিজের নামে প্রচার শুরু করে দেয় সে। "লোধা সাঁওতাল দলের ক্যাডার। তাদের হাতে চাঁচারি, ব্যানার, মাইকে গলায় গর্জন, বিনা বিচারে বন্দি নেতা আরাতুলের মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। দেশকে নেতা হামারা নেতা, আরাতুল আরাতুল।"[১৭] অবশেষে ভোটে দাঁড়ায় আরাতুল। এবং জেতেও। তার সহায়তায় দিল্লিতে গঠিত হয় মিলিজুলি সরকার। কিন্তু একসময় দলের প্রেসিডেন্ট তাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠায়। কেননা তার নামে দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে আনা হয়েছে নানা অভিযোগ। সমস্ত অভিযোগের যোগ্য জবাব দেয় আরাতুল। কিন্তু যখন তার বিরুদ্ধে বলা হয়, "মাননীয় পরোপকারী সাংসদ আরাতুলজি বেআইনি আর্মস পাচার গ্যাং-এর সঙ্গে যুক্ত। মাওবাদী এবং জনযুদ্ধ গোষ্ঠী এই আর্মস নিয়ে সারা দেশে সন্ত্রাস চালায়। খুন নাকাবন্দি করে। জওয়ান পুলিশদেরও মার্ডার করে।"[১৮] সবাইকে অবাক করে সে এই অভিযোগ মেনে নেয়। সঙ্গে আরাতুল বলে,

> "আমি ঝাড় জঙ্গলের হাভাইতা ছেলা। দিনে এক মুঠাও ভাত জুটতনি। খিদার পুড়ানিতে না হয় খারাপ সঙ্গে ভিড়ে গেছি। গুলি বন্দুক পাচারও করছি। কিন্তু আপনারাই সেই সজ্জন বেআইনি মালের খরিদ্দার। বন্দুক গুলি খরিদ করে গরিব আদিবাসীদের খুন করছেন। রাজ কায়েম রাখছেন। ভোটে লড়ছেন..."[১৯]

আরাতুলের এই স্বীকারোক্তি স্পষ্ট করে অধিকারের প্রকৃত অর্থ। নেতার ক্ষমতার আসল মানে। জনকল্যাণ হেতু নির্বাচিত হয় দেশের নেতা। কিন্তু তার বদলে তারা সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করে রাজনৈতিক অধিকার বজায় রাখার লীলাখেলায়। সঙ্গে নিজের আখের গোছাতে। তাই আরাতুলের উত্তরের আর কোনো জবাব দিতে পারে না তারা। এবং শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে এক অদ্ভুত বার্তা দেওয়া হয়। "প্রেসিডেন্টও বিব্রত। হট্টগোল থামাতে চিৎকার করেন। রুলিং শুনিয়ে বলেন, আলোচনার শেষের অংশ সভার কার্যক্রম থেকে বাতিল গণ্য হবে। অভিযোগটি প্রশাসন সংশ্লিষ্ট। পার্টির এক্রিয়ারভুক্ত নয়। আপাতত প্রসঙ্গটি অনির্দিষ্টকাল মুলতুবি থাকল। সভা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ।"[২০]

"চেতনা কী? এ প্রশ্নটিকে একটি রূপকের সাহায্যে বলা যায়, চেতনা হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক, যিনি জীবিত প্রাণীর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু যেসব কাজে ছাত্র যথেষ্ট শিক্ষিত হয়েছে সে সবের মোকাবিলা করার জন্য নিজের মতো ছেড়ে দেন।"[২১] অর্থাৎ 'চেতনা' হল মানুষের সেই সুপ্ত অধিকারবোধ যা লুকিয়ে থাকে তারই প্রকৃতির অন্তরালে। যাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পায় মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের 'ছদ্ম চেতনা'। যাকে কেন্দ্র প্রকাশ্যে আসে অধিকার প্রয়োগ ও প্রয়োগের নানা কলাকৌশল। গল্পের মাধ্যমে বিষয়টি একটু স্পষ্ট করে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'যীশু খ্রীষ্টের নারী' গল্পের কথাই ধরা যাক। যেখানে কানাই কুণ্ডু বলছেন অনুনয়ের কথা। যে শহর থেকে এসেছে ধুলোডাঙা গ্রামের স্কুলের মাস্টার হয়ে। যেখানে গ্রাম অনুনয়ের চোখে অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতিতে জড়ানো। অথচ চারিদিকে দারিদ্র্যের অন্ধকার থমথম করছে। এখানে এসে তার সাথে পরিচয় হয় মনীশের। বন্ধুত্ব গভীর হয় তাদের। সবাই মনীশকে

পাগল বলে। কিন্তু অনুনয় বোঝে মনীশ পাগল নয়। একটু বেশি অনুভূতি প্রবণ। তাই মনীশের স্ত্রী তনুকে সে বলে, "উনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বলা যায়, আমাদের চেয়েও কিছু বেশি অনুভূতিপরায়ণ।"[২২] দেখা যায়, মনীশের এই সুন্দরকে খুঁজে বেড়ানো, জ্যোৎস্নার আনন্দে ডুবে যাওয়া— তনু বোঝে এবং মানে। কিন্তু মানতে পারে না, "পাশে বসে মোহিত হয়ে দেখে অথচ ভোগ করতে জানে না।"[২৩] অনুনয়ও বোঝে মনীশ ও তনুর সম্পর্কের এই দূরত্ব। কিন্তু নিজেকে সর্বদাই এর থেকে সংযত রাখে। দূরত্ব বজায় রাখে। কিন্তু একদিন সব ওলট-পালট হয়ে যায়। যখন মনীশ এসে ঝাওবনের মধ্য থেকে আবিষ্কার করে তনু ও অনুনয় নামক দুই তৃষিত মাতালকে। "হঠাৎ মনীশ কাছে আসে। তখন অনুনয়ের কোলে তনু। সে বলে, হ্যাঁ রে। এমনি করেই বিলিয়ে দিতে হয়। তবেই তো পাওয়া। তোরা বসে থাক। আমি গান গাই।"[২৪] এই 'পাওয়া' শব্দটির মধ্যে দিয়ে কিন্তু অনুনয়কে ছোটো করতে চায়নি মনীশ। বরঞ্চ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের জবরদখলি অধিকার থেকে তনুকে মুক্তি দিতে চেয়েছে। আসলে এটিই সেই চেতনার অধিকার। যা সুপ্ত হয়ে থাকে মানুষের প্রকৃতির অন্তরালে। আর তার বহিঃপ্রকাশের গ্রহণযোগ্যতার ওপরে নির্ভর করে চেতনার ছলনা। অনুনয়ের ক্ষেত্রে তা কাজ করেছে চেতনার ছলনা হিসাবে। আর মনীশের ক্ষেত্রে তা এসেছে চেতনার মুক্তির পথ ধরে। আসলে এই মুক্তিই তো আধিকারের জবরদখলি খেলা থেকে মুক্তি। তাই মনীশ নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছে, "... তুই চলে যাচ্ছিস নাকি! আমি তো রাগ করিনি।"[২৫] কিন্তু অনুনয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি ছিল বিপরীত। অধিকার বোধের ছলনা গ্রাস করেছিল তার চেতনাকে। তাই শেষ পর্যন্ত অপরাধবোধকে সঙ্গে করে নিজস্ব বেদনার জবরদখলি ভাবনা নিয়ে পালাতে হয়েছে তাকে। সেই কারণেই হয়তো শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে কাজ করেছে এক গভীর সংশয়। "বাস আসে। লাফিয়ে ভেতরে ওঠে অনুনয়। বিদায় জানাতে হাতটা নাড়বে কি না ভাবে।"[২৬]

সত্তরের গল্পকার হয়েও একটি নির্দিষ্ট গল্পরীতি বা বিষয়কে অনুসরণ করেননি কানাই কুণ্ডু বা পার্থ গুহবক্সী। কেবল নকশালীয় রাজনীতি, কিংবা রাজনৈতিক পালাবেদলের মধ্যে তাঁদের গল্প সীমাবদ্ধ হয়নি। আর হয়নি বলেই বলতে পেরেছেন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের স্বভাবের কথা। আলো ফেলে দেখাতে পেরেছেন তাদের চেতনার রঙ বদলকে। যা করতে গিয়ে বদল ঘটেছে তাঁদের গল্পের ভাবনায় ও যুক্তিতে। এবং যার প্রতিফলন ঘটেছে গল্পের ভাষায়, গল্পের আঙ্গিকে। এমনকি ঘটেছে গল্পের বিষয়েও। তাই কানাই কুণ্ডু ও পার্থ গুহবক্সী তাঁদের প্রতিটি গল্পেই ধরার চেষ্টা করেছেন সাধারণ মধ্যবিত্তের মানসিক অবস্থানকে। লুকিয়ে থাকা ছদ্ম মানসিকতাকে। ছদ্ম অধিকারবোধকে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতোই তাঁরাও গল্পে অমৃতলোকের যাত্রী হয়ে পৌঁছে গিয়েছেন নিজস্ব অভিষ্ঠে। যেখানে বাস্তবের ন্যায়বিচারের থেকে গল্পের ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভঙ্গিমাই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠকের কাছে। দেখা যায় 'অধিকার' শব্দটা বস্তু সাপেক্ষে যতটা সহজ, ব্যক্তি সাপেক্ষে ঠিক ততটাই জটিল। কেননা বস্তু সাপেক্ষের অধিকার কমবেশি পরিবর্তনশীল। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে তার অবস্থান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াধর্মী। আর প্রতিক্রিয়াধর্মী বলেই তার সাথে জড়িয়ে পড়ে দখলদারিত্বের প্রসঙ্গ। কানাই কুণ্ডু ও পার্থ গুহবক্সীর গল্পের চরিত্রের মধ্যে এই ভাবনাই মিশে রয়েছে। কখনো প্রত্যক্ষভাবে, আবার কখনো তা পরোক্ষভাবে। আসলে এটিই হলো আধুনিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক চরম সত্য। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মানুষের দখলদারিত্বের হিসেব নিকেশ।

সূত্র নির্দেশ:

১. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (প্রথম খন্ড), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা ২৫, দশম মুদ্রণ ২০২৩, পৃষ্ঠা: ৫৬
২. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' (সপ্তম খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৮০
৩. 'অমৃত মন্থন', কানাই কুণ্ডু, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯১, প্রথম সংস্করণ ২০১৩, পৃষ্ঠা:৬০
৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬২
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৮
৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ৬৮
৮. 'দ্বিতীয় লিঙ্গ', সিমোন দ্য বোভোয়ার, অনুবাদ হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা, সপ্তম মুদ্রণ ২০১৯, পৃষ্ঠা: ৩৫৬
৯. 'পাঁচ গল্পকারের ২৫টি গল্প', পার্থ গুহবক্সী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৪২০, পৃষ্ঠা: ১৫৬
১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৬
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৭
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৮
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫৯
১৪. 'শাস্ত্রবিরোধী গল্প', পার্থ গুহবক্সী, দ্র. 'পোড়া প্রদর্শনী', শেখর বসু (সম্পা.), এবং মুশায়েরা, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১০,
পৃষ্ঠা: ১৪৮
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৪৯
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫০
১৭. 'আরো পঞ্চাশ', কানাই কুণ্ডু, একুশ শতক, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৮৮
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯১
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯১
২০. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯২
২১. 'গদ্য সংগ্রহ' (১), সাধন চট্টোপাধ্যায়, দ্র. 'অভিজ্ঞতা, চেতনা ও মূল্যবোধ', দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃষ্ঠা: ১৯৪
২২. 'আরো পঞ্চাশ', কানাই কুণ্ডু, একুশ শতক, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৬
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ২১
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ২১
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ২১